চাষীর গ্রামে নবান্নের সমারোহ কিছু বেশী, এইটিই সত্যকারের সার্বজনীন উৎসব। চাষের প্রধান শস্য হৈমন্তী ধান মাঠে পাকিয়া উঠিয়াছে; এইবার সে ধান কাটিয়া ঘরে তোলা হইবে। কার্তিক সংক্রান্তির দিনে কল্যাণ করিয়া আড়াই মুঠা ধান কাটিয়া আনিয়া লক্ষ্মী পূজা হইয়া গিয়াছে। এইবার আজ লঘু ধানের চাল হইতে নানা উপকরণ তৈয়ারী করিয়া পিতৃলোক এবং দেবলোকের ভোগ দেওয়া হইবে। তাহার সঙ্গে ঘরে ঘরে হইবে ধান্যলক্ষ্মীর পূজা। ছেলেমেয়েরা সকাল-বেলাতেই সব স্নান সারিয়া ফেলিয়াছে। অগ্রহায়ণের তৃতীয় সপ্তাহে শীতও পড়িয়াছে; তবুও নবান্নের উৎসাহে ছেলেরা পুকুরের জল ঘোলা করিয়া তবে উঠিয়াছে। তাহারা সব এখন চণ্ডীমণ্ডপের আঙিনায় রোদে দাঁড়াইয়া খোঁড়া পুরোহিতের কঙ্কালসার ঘোড়াটাকে লইয়া কলরব করিতেছে। বুড়ো শিব এবং ভাঙা কালীর মন্দিরে ভোগ না হইলে নবান্ন আরম্ভ হইবে না। কুমারী কিশোরী মেয়েরা ভিজা চুল পিঠে এলাইয়া দিয়া নতুন বাটিতে নতুন ধানের আতপ চাল, চিনি, মণ্ডা, দুধ, কলা, আখের টিকলি, আদাকুচি, মূলাকুচি সাজাইয়া দক্ষিণা সহ মন্দিরের বারান্দায় নামাইয়া দিতেছে। অধিকাংশই চার পয়সা, কেহ দু-পয়সা, কেহ এক পয়সা, দু-চার জনে দিয়াছে দু-আনা। যাহাদের বাড়ীতে কুমারী মেয়ে নাই, তাহাদের ভোগ সামগ্রী প্রবীণারা লইয়া আসিতেছে। গ্রামের পুরোহিত—খোঁড়া চক্রবর্তী বসিয়া সামগ্রীগুলি লইয়া দেবতার সম্মুখে রাখিয়া দক্ষিণাগুলি ট্যাঁকে পুরিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে ধমক দিতেছে ওই ছেলেগুলিকে—এ্যাই এ্যাই! এ্যাই ছেলেগুলো এতো ভারী বদ! যাস না কাছে, চাট ছোড়ে তো পিলে ফাটিয়ে দেবে।

অর্থাৎ ওই ঘোড়াটা। ঘোড়াটা পিছনের পা ছুড়িলে প্লীহা ফাটিয়া যাইবে। খোঁড়া চক্রবর্তী গ্রাম-গ্রামান্তরে ওই ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া যজমান সাধিয়া ফেরে। ফিরিবার সময় ঘোড়ার উপর থাকে সে—তাহার মাথায় থাকে চাল-কলা ইত্যাদির বোঝা। ঘোড়া খুব শিক্ষিত, চক্রবর্তী প্রায়ই লাগাম না ধরিয়া দুই হাতে বোঝা ধরিয়া অনায়াসে চলে; অবশ্য ইচ্ছা করিলে চক্রবর্তী মাটিতে পা নামাইয়া দিতে পারে। মাটি হইতে বড় জোর ফুটখানেক উপরে তাহার পা দুইটা ঝুলিতে ঝুলিতে যায়।

ছেলেদের কতকগুলো দূর হইতে ঢেলা ছুড়িয়া ঘোড়াটাকে ক্রমাগত মারিতেছিল। কতকগুলো অতিসাহসী গাছের ডাল লইয়া পিছন দিক হইতে পিটিতেছিল। পুরোহিত ভয়ানক চটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কোন উপায় সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। ছেলেগুলো যেন তাহার কথা কানেই তুলিবে না

বলিয়াই একজোট হইয়াছে। একটি প্রৌঢ়া বিধবা ভোগের সামগ্রী লইয়া আসিয়াছিল—সেই পুরোহিতের উপায় করিয়া দিল ; সে বলিল—এঁ্যা তোরা সব ওই ঘোড়াটাকে ছুঁলি ? বলি —ওরে ও মেলেচ্ছোর দল। যা, আবার সব চান করগে যা।

পুরোহিত বলিল,—দেখ বাছা দেখ, বজ্জাত ছেলেদের কাণ্ড দেখ। চাঁট ছোড়ে তো পিলে ফাটিয়ে দেবে। তখন নাম-দোষ হবে আমার !

বিধবা কিন্তু এ কথাটা মানিল না, সে বলিল,—ও-কথা আর বল না। ঠাকুর। ওই ছাগলের মত ঘোড়া—ও নাকি পিলে ফাটিয়ে দেবে ? তুমিও যেমন। ছেলেদের বলছি কেন, তোমারও তো বাপু আচার-বিচার কিছু নাই। সামনের দুটো পায়ে বেঁধে ছেড়ে দাও, রাজ্যের আঁস্তাকুড়, পাতা, ময়লা মাড়িয়ে চলে বেড়ায়। সেদিন আমাদের গাঁয়ে এসে নতুন পুকুরের পাড়ে—মা-গোঃ, মনে করলেও বমি আসে—চান করতে হয়—সেইখানে দেখি ঘাস খাচ্ছে। আর তুমি ওই ঘোড়াতে চেপে এসে দেবতার পুজো কর ?

পুরোহিত বলিল,—গঙ্গাজল দি মোড়ল পিসী, রোজ সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরলে গঙ্গাজল দিয়ে তবে ওরে ঘরে বাঁধি। আমি তো গঙ্গাজল-স্পর্শ করিই।

—ও সব তোমার মিছে কথা।

—ঈশ্বরের দিব্যি। পৈতে ছুঁয়ে বলছি আমি ! গঙ্গাজল না দিলে ও কিছুতেই বাড়ী ঢোকে না। বাইরে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঠুকবে আর চিঁ হি চিঁ হি করে চেঁচাবে।

মোড়ল পিসী কি বলিতে গিয়া শশব্যস্ত হইয়া সম্মুখের দিকে খানিকটা সরিয়া গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল—কে লা ? হন হন করে আসছে দেখ।—পিছন দিক হইতে কোন আগন্তুকের দীর্ঘচ্ছায়া মাথাটা তাহার পায়ের উপর পড়িতেই মোড়ল পিসী সংস্পর্শের ভয়ে সরিয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—কে ?

একটি বধূ দীর্ঘাঙ্গী—অবগুণ্ঠনাবৃত মুখ ; সে উত্তর করিল না, নীরবে ভোগ-সামগ্রীর পাত্রখানি পুরোহিতের হাতের সম্মুখে নামাইয়া দিল।

—অ ! আমাদের কামার বউ ! আমি বলি কে-না কে !

এই মুহূর্তেই ডাক্তার ও পণ্ডিত আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিল। দেবনাথ বিনা ভূমিকায় বলিল—ঠাকুর, কামারের পুজো গাঁয়ের সামিলে আপনি করবেন না, সে হতে আমরা দোব না।

জগন ও দেবু এই সুযোগটিরই প্রতীক্ষা করিয়া নিকটেই কোথাও দাঁড়াইয়া

ছিল, পদ্মকে চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও আসিয়া হাজির হইয়াছে।

ঠাকুর কিছুক্ষণ পণ্ডিতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—সে আবার কি রকম? গাঁ-সামিলে পুজো না হলে কি করে পুজো হবে?

—সে আমরা জানি না, কর্মকার বুঝে করবে। সে যখন গাঁয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে, তখন আমরাই বা তাকে গাঁয়ের সামিলে ক্রিয়াকর্মে নোব কেন?

পদ্ম তেমনি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। ঠাকুর তাহার দিকে চাহিয়া নিতান্ত নিরুপায়ভাবে বলিল—তাহলে আর আমি কি করব মা!

দেবনাথ পদ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—পুজো তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, বলগে কর্মকারকে, পুজো দিতে দিলে না গাঁয়ের লোক।

পদ্ম এবার ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, কিন্তু পুজোর পাত্র তুলিয়া লইয়া গেল না, সেটা এবং দক্ষিণার পয়সা সেখানেই পড়িয়া রহিল।

পুরোহিত বিব্রত হইয়া বলিল - ওগো ও বাছা পুজোর ঠাঁইটা নিয়ে যাও! ও বাছা, ও কামার-বউ!

দেবু আবার বলিল—থাক না। কামার তো এখুনি আসবেই। যা হোক একটা মীমাংসা আজ হবেই।—দেবু ঘোষের গোপনতম অন্তরে কর্মকারের উপর একটু সহানুভূতি এখনও আছে; অনিরুদ্ধ তাহার সহপাঠী, তা ছাড়া অন্যায় অনিরুদ্ধেরই একার নয় এবং অনিরুদ্ধই প্রথমে অন্যায় করে নাই। গ্রামের লোকই অন্যায় করিয়াছে প্রথম। সে কথাটাও তাহার মনে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল।

পুরোহিত ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে পারে নাই, বুঝিবার ব্যগ্রতাও তাহার ছিল না! উপস্থিত একবাড়ীর আতপতণ্ডুল দুধ-মণ্ডা প্রভৃতি পুজোর সামগ্রী বাদ পড়িয়া যাইতেছে—সেই চিন্তাটাই তাহার বড়। তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বলিল,— বলি ওহে ডাক্তার, ও পণ্ডিত—

জগন বাধা দিয়া দৃঢ় আদেশের ভঙ্গীতে তাহাকে বলিল—গিরীশ ছুতোর, তারা নাপিত এদের পুজোও হবে না ঠাকুর, বলে রাখছি আপনাকে। আমরা অবিশ্যি একজন-না একজন শেষ পর্যন্ত থাকব, তবে যদি না থাকি—সেজন্যে আগে থেকে বলে রাখছি আপনাকে।

ঠিক এই সময়ে ছিরু পাল আসিয়া ডাকিল,—ঠাকুর!—ছিরুর পরণে

আজ গরদের কাপড়, গায়ে একখানি রেশমী চাদর ; ভাবে-ভঙ্গিতে ছিরু পাল আজ একটি স্বতন্ত্র মানুষ !

পুরোহিত চক্রবর্তী ব্যস্ত হইয়া বলিল—এই যাই বাবা। আর বড় জোর আধ ঘণ্টা। ও পণ্ডিত, ও ডাক্তার, কই হে, সব আসছে না কেন ?

গম্ভীরভাবে জগন ডাক্তার বলিল - এত তাড়াতাড়ি করলে তো হবে না ঠাকুর ! আসছে সব, একে একে আসছে। একঘর যজমানের জন্য দশজনকে ব্যতিব্যস্ত করতে গেলে তো চলবে না।

ছিরু বলিল,—বেশ—বেশ ! দশের কাজ সেরেই আসুন। ঠাকুর ! আমি একবার তাগাদা দিয়ে গেলাম।—তারপর ছিরু তাহার প্রকাণ্ড বিশ্রী মুখখানাকে যথাসাধ্য কোমল এবং বিনীত করিয়া বলিল,—ডাক্তার, একবার যাবেন গো দয়া করে। দেবু খুড়ো দেখে শুনে দিয়ে এস বাবা—

কথাটা তাহার শেষ হইল না, অনিরুদ্ধের প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ চীৎকারে চণ্ডীমণ্ডপটা যেন অতর্কিতে চমকিয়া উঠিল !

—কে ? কে ? কার ঘাড়ে দশটা মাথা ? কোন নবাব-বাদশা আমার পুজো বন্ধ করেছে শুনি ?

অনিরুদ্ধের সে মূর্তি যেন রুদ্র-মূর্তি !

চক্রবর্তী হতভম্ব হইয়া গেল, দেবনাথ সোজা হইয়া দাঁড়াইল, জগন ডাক্তার বিজ্ঞ সান্ত্বনাদাতার মত একটু আগাইয়া আসিল ; ছিরু পাল যথাস্থানে অচঞ্চল স্থিরভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার বলিল—থাম, থাম, চীৎকার করিস না অনিরুদ্ধ।

ব্যঙ্গভরা ঘৃণিত দৃষ্টিতে চকিতে একবার ছিরু পাল হইতে ডাক্তার পর্যন্ত সকলের দিকে চাহিয়া অনিরুদ্ধ মন্দিরের দাওয়া হইতে পদ্মের পরিত্যক্ত পূজার পাত্রটা তুলিয়া লইল। পাত্রটা এবং দুই হাতে খানিকটা উপরে তুলিয়া যেন দেবতাকে দেখাইয়া বলিল,—হে বাবা শিব, হে মা কালী—খাও বাবা, খাও মা, খাও ! আর বিচার কর, তোমরা বিচার কর, তোমরা বিচার কর।—বলিয়াই সে ফিরিল।

ডাক্তারের চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল, কিন্তু অনিরুদ্ধকে ধরিয়া নির্যাতন করিবার কোন উপায় ছিল না।

অনিরুদ্ধ খানিকটা গিয়াই কিন্তু ফিরিল, এবং দক্ষিণার পয়সা কয়টা ট্যাঁকে গুঁজিয়া দেখিল দেবু ঘোষ ও জগন ডাক্তারের অল্প দূরে তখনও দাঁড়াইয়া আছে ছিরু পাল। তাহার ক্রোধ মুহূর্তে যেন উন্মত্ততায় পরিণত হইয়া গেল। সে

চীৎকার করিয়া উঠিল,—বড় লোকের মাথায় আমি ঝাড়ু মারি, বিদ্বেনের মাথায় আমি ঝাড়ু মারি, আমি কোন শালাকে মানি না, গ্রাহ্য করি না। দেখি—কোন্ শালা আমার কি করতে পারে।

মুহূর্তের জন্য সে ছিরুর দিকে ফিরিয়া যেন তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

খোঁড়া পুরোহিত ও মোড়ল পিসী একটা বিপর্যয় আশঙ্কা করিয়া শিহরিয়া উঠিল। ইহার পরই অনিরুদ্ধের উপর ছিরু পালের বাঘের মত লাফাইয়া পড়ার কথা; কিন্তু আশ্চর্য, ছিরু পাল আজ হাসিয়া অনিরুদ্ধকে বলিল—আমাকে মিছিমিছি জড়াচ্ছ, কর্মকার, আমি এ-সবের মধ্যে নাই। আমি এসেছিলাম পুরুত ডাকতে।

অনিরুদ্ধ আর দাঁড়াইল না, যেমন হন হন করিয়া আসিয়াছিল, তেমনি হন হন করিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতেও সে বলিতেছিল—সব শালাকে আমি জানি। ধার্মিক—রাতারাতি সব ধার্মিক হয়ে উঠেছে।

ছিরু অবিচলিত ধৈর্যে স্থির প্রশান্তভাবেই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া বাড়ীর পথ ধরিল। ছিরুর চরিত্রের এই একটি বৈশিষ্ট্য। যখন সে ইষ্ট স্মরণ করে, কোন ধর্ম-কর্ম বা পূজা-পার্বণে রত থাকে—সে তখন স্বতন্ত্র মানুষ হইয়া যায়। সেদিন সে কাহারও সহিত বিরোধ করে না, কাহারও অনিষ্ট করে না, পৃথিবী ও বস্তু-বিষয়ক সমস্ত কিছুর সহিত সংস্রবহীন হইয়া এক ভিন্ন জগতের মানুষ হইয়া উঠে। অবশ্য সমগ্র হিন্দুসমাজের জীবনই আজ এখনই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; কর্মজীবন এবং ধর্মজীবন একেবারে স্বতন্ত্র—দুইটার মধ্যে যেন কোন সম্বন্ধ নাই। ইষ্ট স্মরণ করিতে করিতে যাহার চোখে অকপট অশ্রু উদ্গত হয়, সেই মানুষই ইষ্ট স্মরণ-শেষে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বিষয়ের আসনে বসিয়া জাল-জালিয়াতি সুরু করে। শুধু হিন্দু সমাজই বা কেন? পৃথিবীর সকল দেশে—সকল সমাজেই জীবন-ধারা অল্পবিস্তর এমনই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর কথা থাকুক, ছিরুর জীবনে এই বিভাগটা বড় প্রকট—অতি মাত্রায় পরিস্ফুট। আজিকার ছিরু স্বতন্ত্র, এই ছিরু যে কেমন করিয়া ব্যভিচারী পাষণ্ড ছিরুর প্রচণ্ড ভার ঠেলিয়া দেবপূজাকে উপলক্ষ করিয়া বাহির হইয়া আসে—সে অতি বিচিত্র সংঘটন। পাষণ্ড ছিরুর অন্যায় বা পাপে কোন ভয় নাই, দেবসেবক ছিরুরও সে পাপখণ্ডনের জন্য কোন ব্যগ্রতা নাই। আছে কেবল পরমলোক-প্রাপ্তির জন্য একটি নিষ্ঠাভরা তপস্যা এবং